অভিন্নহৃদয়েষু

প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণা

আজ থেকে ১২৫ বছর আগে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসেই দুজনে জন্মেছিলেন একদিন আগে আর পরে। জন্মমুহূর্তের এই নৈকট্য তাঁদের দুজনকে একদিকে যেমন খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছিল, তেমনই একটি দিনের ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল পরিণতিতে বিপুল পার্থক্য। একজন সুরসাধক দাদাজী আর অন্যজন দেশবরেণ্য নেতাজী। ২২ জানুয়ারি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায়ের আর ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন। আকৈশোর তাঁরা ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু। এ-প্রবন্ধ তাঁদের পরস্পরের অন্তরঙ্গতার ইতিহাসের অবলোকন। দিলীপকুমার লিখেছেন, ''আমার যখন বারো বছর বয়স তখন থেকেই আমি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়ে উঠি। দক্ষিণেশ্বরের সেই বিচিত্র সাধকের উপলব্ধি আমার জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর মতো আমারও ধারণা—'জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে পাওয়া'।'' ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরচেতনায় আকৃষ্ট এই কিশোরের কাছে অপরজনের প্রতি অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত হয়েছিল বোধহয় একটি কারণেই—''সুভাষ বাল্যকালেই একবার সন্ন্যাসী হওয়ার আশায় ঘর ছেড়েছিলেন।''

শুরুটা আর একটু গোড়া থেকেই করা যাক। দিলীপ তখন স্কুলের ছাত্র। ঘটনাচক্রে সুভাষের সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে থেকেই তাঁর সম্পর্কে কৌতূহল তৈরি হয়েছিল দিলীপের। লোকমুখে সুভাষের কথা শুনে দিলীপের মনে গভীর ছাপ পড়ছে—তাঁর পূর্বতন নায়ক স্কুলের ফার্স্টবয় ক্ষিতীশের জায়গাটা ধীরে ধীরে অধিকার করে নিচ্ছেন সুভাষ। এরমধ্যেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় সুভাষ হলেন দ্বিতীয়, ক্ষিতীশ সপ্তম আর দিলীপ নিজে বাইশতম স্থান অধিকার করলেন। সুভাষের অসাধারণ সাফল্যে রাতারাতি ঘটল 'হিরো' বদল। সুভাষের যেকোনও খবরে দিলীপের ছিল অপরিসীম আগ্রহ। সুভাষ সম্পর্কে তার যে-ধারণা তৈরি হয়েছিল সেগুলি হল : সুভাষ অসাধারণ বিদ্বান, পবিত্র তার চরিত্র, সে স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত, বাল্যকালেই একবার ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল। দিলীপের এই ধারণাগুলি শুধু ধারণামাত্র ছিল না, এর সত্যতা বাস্তবে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি অনুভব করেছেন বারংবার।

ইতিমধ্যে সুভাষ কটক থেকে চলে এসে কলকাতায় থাকছেন এলগিন রোডে। পিতার মৃত্যুর পর দিলীপও উঠে এসেছেন থিয়েটার রোডে

মাতামহ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রাসাদোপম বাড়িতে। সেখান থেকে সুভাষদের বাড়ি বড়জোর আধ মাইল। দুজনেই প্রেসিডেন্সির ছাত্র। প্রেসিডেন্সিতে প্রথম যেদিন দিলীপ সুভাষকে দেখেছিলেন সেদিন কথা বলতে পারেননি, তাঁর মনে হয়েছিল, ''হঠাৎ আমার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত হয়ে গেল, কেমন যেন থতমত খেয়ে যাই। এক্ষেত্রে আলাপের প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া দেবতার বেশি কাছে ঘেঁসতে যাওয়া নিরাপদ নয়—এ আমি ওই বয়সেই বুঝতে শিখেছিলাম। এরপর প্রায়ই যেতাম এলগিন রোডের পথ দিয়ে, যেতে যেতে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত একটি বিশেষ বাড়ির দোতলার ঘরের দিকে। আকর্ষণের কারণ ওই ঘরে থাকে সুভাষ।'' লজ্জা দ্বিধা কাটিয়ে কোনওদিন তিনি সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। তবে ছোটবেলায় সুভাষ সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, এই ভাবনার ওপর ভর করে কিশোর দিলীপ কল্পনার জাল বুনতেন, তাঁর মনে হত, ''একদিন দুজনে পথে ভিখারি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি—পরণে কৌপীন, আমরা সন্ন্যাসী, গান গেয়ে পথ চলি—'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।' ''

সেইসময় তাঁর একবারও মনে হয়নি, সুভাষ হয়তো তাঁর মতো অধ্যাত্মমার্গকেই জীবনের চরম আশ্রয় বলে বিশ্বাস করেন না। তরুণ মনের নিয়মই হচ্ছে নিজের খেয়ালখুশি মতো কল্পনায় উধাও হয়ে চলা। দিলীপের মনের এরকম অবস্থায়, এক রোদ-ঝলমল সুন্দর সকালে সুভাষ নিজেই এসে হাজির তার বাড়িতে। বিস্ময়ে হতবাক দিলীপ। আনন্দ সামলাতে পারছেন না। মনে হচ্ছে, লজ্জায় দ্বিধায় মহম্মদ পর্বতের কাছে যেতে পারেননি, তাই পর্বতই নেমে এসেছে। আসলে সুভাষ এসেছিলেন কলেজে তাঁদের বিতর্কসভায় যাতে দিলীপ যোগ দেন সেই প্রস্তাব নিয়ে। বিতর্কসভার উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুভাষ নিজেই। তিনি বললেন, দেশের এই পরিস্থিতিতে তর্ক-বিতর্কের বিশেষ প্রয়োজন, তাতে বাগ্মিতা গড়ে ওঠে আর দেশে বাগ্মীর বিশেষ প্রয়োজন। দিলীপ তো আকাশ থেকে পড়লেন। খানিক সামলে নিয়ে বললেন, ''শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেননি তর্ক দিয়ে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না?''

তার উত্তরে সুভাষ নানা কথার পর বললেন, ''দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তো বলেছেন, 'চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,/ জাগিব নতুন ভাবের রাজ্যে রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।' ''

দিলীপ অবাক হয়ে বললেন, ''তাঁর কবিতা আপনার মনে আছে?''

''অন্তরে গাঁথা আছে।'' সুভাষের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—''তাঁর মতো স্বদেশি কবি দুর্লভ।''

সেদিন থেকে সুভাষ দিলীপের আরও প্রিয় হয়ে উঠলেন। সুভাষ সেদিন দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, ''দেশের জন্য জীবন দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখব। শুধু ভাবপ্রবণতায় ইন্ধন জোটে না তাই আমাদের অস্ত্র-বর্ম সংগ্রহ করতে হবে, আধুনিক জগতের যোগ্য করে তুলতে হবে নিজেদের।''

দিলীপ একথার কী জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না, তাঁর মন ভক্তগায়কের মতো, সেখানে আধুনিকতার তিলমাত্র ঠাঁই নেই। সুভাষ বললেন, ''দেখুন দিলীপবাবু,... আমি আপনার কাছ থেকে কথা চাই, আপনি আমাদের বিতর্কসভায় আসুন।'' দিলীপ উত্তর দিলেন, ''আচ্ছা যাব।'' তারপর আমতা আমতা করে বললেন, ''শ্রোতা হিসেবে, বক্তা হিসেবে নয়।'' শুনে সুভাষ হেসেছিলেন। ''হাসলে তাকে এত ভাল দেখায়, এত ভাল আর কিছুতে নয়''—সেই আনন্দের মুহূর্তে এই ছিল মুগ্ধ দিলীপের গভীর উপলব্ধি। সেই থেকে শুরু।

এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত ওটেনের ঘটনায় সুভাষের যে-মহত্ত্ব ঝলসে উঠেছিল

সেকথা ধরা পড়েছে দিলীপের স্মৃতিচারণে। সুভাষ 'বর্ন লিডার'। পরিণাম চিন্তা না করে দুর্দম সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সকলের অপমানের শরিক হতে। ওটেন সাহেব ক্লাস থেকে ফেরার সময় কয়েকজন ছাত্র মুখোশ পরে তাঁর ওপর চড়াও হল, এই ঘটনায় সুভাষের সমর্থন থাকলেও সুভাষ সে-দলে ছিলেন না। কিন্তু সমস্ত ঘটনার দায়ভার এসে পড়ল তাঁর ওপর। পরের দিন খবরের কাগজে হেডলাইন হল। পরিবারের বাধানিষেধ সত্ত্বেও দিলীপ ছুটে গেলেন সুভাষের কাছে, এলগিন রোডে। ঘরে খিল দিয়ে ফিসফিসিয়ে সুভাষকে বললেন, ''আমাকে বাদ দিলে কেন সুভাষ?'' সুভাষ গভীর স্নেহে দিলীপের পিঠ চাপড়ে বললেন, ''তোমার ভাই, মা বাবা নেই, দাদামশায়ের কাছে আছ—তোমাকে কেন মিথ্যে বিপদের মধ্যে টানা?—না দিলীপ, এ তোমার কাজ নয়।''

''সুভাষ ধরা পড়ল 'রিং লিডার' কলঙ্কের জয়তিলক পরে। ধরা ও পড়ত না, যদি ও সঙ্গীদের বাঁচাতে না চাইত। সবাই ওর জয়ধ্বনি করল বটে, কিন্তু ভুগতে হল ওকেই সবচেয়ে বেশি। কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হল দুবছর।'' বিষাদে আচ্ছন্ন দিলীপকে সান্ত্বনা দিয়ে সুভাষ বললেন, ''দুঃখ কী ভাই! পরীক্ষা না দিলে কি আর বিদ্যা হয় না।'' দিলীপ বুঝলেন মুখে একথা বললেও সুভাষের চোখের তলায় কালি, কতই না বেজেছে সুভাষের মনে। পরদিনই সুভাষের চিঠি এল : ''দিলীপ আমার অনুরোধ তুমি আমার সঙ্গে এখন দেখা কোরো না। পুলিশ আমার পিছনে লেগেছে, আমি চাই না তারা তোমারও পিছু নেয়।'' ছোট্ট চিঠি—কিন্তু সুভাষের নিঃস্বার্থ প্রেমিক স্বভাবের পরিচয়। দিলীপ জানেন, যাদের ভালবাসবেন তাদের কথা সুভাষ যেমন ভাববেন সবার আগে—তেমনই তাদের বিপদে আপদে বুক দিয়ে আগলে রাখবেন নিজের কথা না ভেবে। সাধে কি দেশ পরে ওঁকে নেতাজী উপাধি দিয়েছিল ওঁর মহত্ত্বের তর্পণে! কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

এর পরের অধ্যায়ের সূচনা বিদেশে—কেমব্রিজে। সে-কাহিনি বলার আগে দুজনের জীবনে ঘটে যাওয়া এক আধ্যাত্মিক পর্বের কথা না বললে তাঁদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সূত্রটি না বলা থেকে যাবে।

কথা ছিল দিলীপ বিলেতে যাবেন, গণিতে ট্রাইপস নেবেন আর আই সি এস পরীক্ষার জন্য তৈরি হবেন। বিলেতে যাওয়ার আগে তাঁর দাদামশাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম চিকিৎসক ছিলেন, দিলীপকে নিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দের (রাজা মহারাজ) কাছে; কারণ দিলীপ চিরকুমার থাকার সংকল্প নিয়ে বিদেশে যেতে চান। এক্ষেত্রে সাধুর আশীর্বাদই একমাত্র রক্ষাকবচ। দাদামশায়ের সঙ্গে দিলীপ এলেন ব্রহ্মানন্দজীর ঘরে। কী সৌম্য পবিত্র মূর্তি! গেরুয়া রঙে যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন মহারাজ! প্রতাপ মজুমদারকে দেখেই তাঁর কী আনন্দ! শুরু হল ঠাকুরের কথার রোমন্থন। বেশ কিছুক্ষণ পর প্রতাপবাবু মহারাজকে বললেন, তাঁর নাতি দেখতে শুনতে ভাল, পড়াশোনা-গানেও পারদর্শী, বিলেতে গিয়ে না বিপদে পড়ে! শুনে রাজা মহারাজ দিলীপকে বললেন, ''তুমি গান গাইতে পারো বাবা? বেশ বেশ। শোনাও না একটি মা-র নাম—জানো?''

দিলীপ আনন্দে অধীর হয়ে শুরু করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া গান, ''মজল আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।'' গান যখন শেষ হল, তখন মহারাজ সমাধিস্থ। দাদামশায়ের চোখেও জল। অনেকক্ষণ বাদে মহারাজ বললেন, ''প্রতাপবাবু ভয় নেই, এ ছেলের কোনও বিপদ হবে না বিদেশ বিভুঁয়ে।'' আরও বললেন, ''যখন গান গাইছিল—

আমি কী দেখলাম জানেন, ওর চারিদিকে ঠাকুরের কৃপায় একটি aureole-মণ্ডল। এ-কৃপা হল একটি বর্ম—আর আমি জানি এর মর্ম। ও দু-একবার হোঁচট খেতে পারে, কিন্তু পদস্খলন ওর হবে না—আপনাকে বলছি, বিশ্বাস করুন।" দিলীপ তখন রাজা মহারাজকে বললেন, ''আমায় কিছু উপদেশ দিন।" মহারাজ বললেন, ''বাবা, মনে রেখো সদাসর্বদা, ঠাকুর আমাদের বলতেন, কেবলই এই একটি কথা; স্মরণ মনন থাকলেই হল—নিরন্তর মনে মনে তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা। এরই নাম যোগ—যোগের যোগ।"

সুভাষকে গিয়ে একথা বলতেই তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। দিলীপের দুহাত চেপে ধরে বললেন, ''আমিও একথাই বলি ভাই—মনে রেখো তুমি!" আর একটু থেমে বললেন, ''আমিও পেয়েছি তাঁর কৃপার আভাস। তাই তো চাই দেশের কাজে জীবন ঢেলে সার্থক হতে। এও তোমাকে বলছি যে, ওই রাখাল মহারাজই আমাকে কাশী থেকে ফেরত পাঠান, বলেন, আমাকে দেশের কাজ করতে হবে।" এই কথা শুনে দিলীপ আপ্লুত হয়ে বললেন, ''জানি সুভাষ, আর এ তুমিই পারবে।"

তারপর থেকে সুভাষ স্বামীজীর বই আরও গভীরভাবে পড়তে শুরু করেন। এই সময় থেকেই নিবেদিতার 'The Master As I Saw Him' বইটি তাঁর প্রিয় হয়ে ওঠে। এ-প্রসঙ্গে বন্ধু দিলীপকে সুভাষ বলেন, ''শোনো, নিবেদিতা কী বলছেন তাঁর মহান হৃদয় সম্বন্ধে। 'There was one thing, however, deep in the Master's nature, that he himself never knew how to adjust. This was his love of his country and his resentment of her suffering. Throughout these years in which I saw him almost daily, the thought of India was to him like the air he breathed.' " সুভাষ ধরা গলায় পড়ে চলল। এরপরে সুভাষকে এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে আরম্ভ করলেন দিলীপ আর অনুভব করলেন সাধারণ আবেগ নয়—স্বামীজীর উদ্দীপনাই তাঁকে দীক্ষা দিয়েছে জাগৃতিমন্ত্রে।

দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে পাস করার পর সুভাষ একদিন দিলীপকে বললেন, তিনি আই সি এস দিতে বিলেত যাবেন, কেমব্রিজ কলেজে একটা সিটের ব্যবস্থা যেন দিলীপ করে দেন। সুভাষের কথায় একটু অবাকই হয়েছিলেন দিলীপ। কিন্তু সুভাষ তাঁকে জানিয়েছিলেন আই সি এস দিতে রাজি না হলে বাবা তাঁকে বিলেতে পাঠাবেন না।

সুভাষ কেমব্রিজে আসবেন, আবার একসঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধূলা—এই আনন্দেই আত্মহারা হয়ে উঠেছিল দিলীপের মন। কেমব্রিজ পৌঁছে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দিলীপ নিজের ও সুভাষের জন্য ফিটস উইলিয়াম হলে সিটের বন্দোবস্ত করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সুভাষ ইংল্যান্ডে পৌঁছলেন। সেখান থেকে কেমব্রিজ। তাঁর জন্য সিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বলে দিলীপের কাছে ঐকান্তিক কৃতজ্ঞ ছিলেন সুভাষ। দিলীপ লিখেছেন, ''তার কৃতজ্ঞতা কখনও উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেত না, কুণ্ঠিত সঙ্কোচের মাধুর্য ছিল তার স্বভাবে।"

কেমব্রিজের দিনগুলি ছিল বড় আনন্দের। সুভাষ সবসময় বলতেন, ''আমরা বিদেশে এসেছি দেশের কাজের জন্য প্রস্তুত হতে, বিদ্যা জ্ঞান সঞ্চয় করতে, মিথ্যে হাসি গল্প তামাশায় সময় নষ্ট করতে নয়।" সুভাষ সবসময় ফিটফাট থাকতেন, তাঁর বইপত্র কোনওদিন অগোছালো অবস্থায় থাকত না। আর দিলীপ ছিলেন উলটো। সুভাষের এই নিখুঁত সাজগোজকে তাঁর মনে হত পাগলামি। সুভাষ বিদেশের সবরকম প্রলোভন থেকে সাবধান করে দিতেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুটিকে। কেমব্রিজ থেকে

আসার আগে সুভাষ দিলীপকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন : ''মদ স্পর্শ করবে না, নাইট ক্লাবে যাবে না।''

বন্ধুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন দিলীপ। তার একটি কারণ এই যে, সুভাষ নিজে এই কথাগুলি পালন করতেন। বিলেতে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা একবাক্যে সাক্ষ্য দেবেন যে সুভাষ কোনও ইংরেজ মেয়ের দিকে চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাননি। যেসব ছাত্র সুভাষকে 'puritan' বলে ব্যঙ্গ করত, তারাও মনে মনে তাঁর পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতাকে সমীহ না করে পারত না। বিলেতে সুভাষ গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনি, লেনিন, ক্রুপটকিন প্রমুখ দেশনেতাদের বই পড়তেন। আইরিশ ছাত্রদের সঙ্গে মিশতেন। বলতেন, ''ওদের কাছে বিপ্লবের টেকনিক কত শেখবার আছে।'' প্রসঙ্গত, নিবেদিতাও যখন লন্ডনে ছিলেন তখন ক্রুপটকিনের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর বই নিয়ে এসে এদেশে প্রচার করেছিলেন।

ইংল্যান্ড, ১৯২০।
বাঁদিক থেকে দিলীপ কুমার রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি, সুভাষচন্দ্র বসু, সি সি দেশাই।

কলেজে ভর্তি হয়ে সুভাষ একটি মুহূর্তও নষ্ট করেননি। প্রবল বিক্রমে পড়া শুরু করলেন। পরীক্ষা দিলেন মাত্র ন-মাস পড়ে। যারা দু-তিন বছর ধরে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাদেরকে পিছনে ফেলে পরীক্ষায় চতুর্থ হলেন সুভাষ, আর ইংরেজিতে ফার্স্ট। এরপর এল সেই মহাক্ষণ। আই সি এস চাকরিতে ইস্তফা দিলেন তিনি। তখন ইংল্যান্ডে স্বল্প সময়ের মধ্যে আই সি এস-এ চতুর্থ হওয়ার থেকে ওই পদটি ছাড়ার ঘটনায় চারিদিকে একেবারে হইচই পড়ে গেল, প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। যেন বলা যায় ''I woke one morning and found myself famous''। দেশ থেকে চিঠি এল, সুভাষের এই সিদ্ধান্তে তাঁর পিতৃদেব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সুভাষ সেই চিঠি নিয়ে হাজির হলেন দিলীপের কাছে। দিলীপ তাঁকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বললে, বন্ধুর কথায় সুভাষ একটু আহত হলেন। বললেন, ''আমাদের আত্মীয়-স্বজন পরিজনের কথা ভেবে আদর্শ ঠিক করতে হলে সে-আদর্শ যে কেমনতর হবে ভেবে দেখেছ কি?''

এমনই ছিল তাঁর প্রবল দেশপ্রেম। দেশাত্মবোধই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং চেতনার উৎস। তাই সেদিন সমস্যাটি ছিল সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের নয়, দেশে ফেরার পাথেয় জোগাড়। কারণ বাবার কাছ থেকে তো আর জাহাজের ভাড়া চাওয়া যাবে না! সেদিন বন্ধু দিলীপই হয়ে উঠেছিলেন সুভাষের ত্রাণকর্তা। সুভাষ নব্বই পাউন্ড ধার নিলেন দিলীপের কাছ থেকে। দিলীপের আনন্দ আর ধরে না—সুভাষের একটুও কাজে আসতে পেরে ভাবলেন—এমন সৌভাগ্য কজনের হয়? কারণ সুভাষের মতো আত্মশক্তিতে শক্তিমান যুবক সত্যিই খুব বিরল। তাই কি দিলীপ বলেছিলেন তাঁদের প্রজন্মে সুভাষের মতো আর একজনকেও পাননি! তবে এ-প্রসঙ্গে আরও একজনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তরুণ দিলীপ আরও

একজন অসাধারণ মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়েছিলেন : ''বন্ধু হিসেবে সুভাষ আমার কাছে হয়ে উঠেছিল হিরো-ই বলব, তবু সত্যেনের কাছেও আমি জীবনে কম পাথেয় পাইনি—বিশেষ করে চিন্তায়, সংস্কৃতি ও স্বাধীন চিন্তার রাজ্যে।'' সত্যেন অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাঁরই প্রেরণায় তিনি বিদেশি ভাষার পাঠ নিয়েছিলেন। সত্যেন তাঁকে সতর্ক করে বলেছিলেন, ''দেখো, উচ্চারণ (বিদেশি ভাষার) যেন ঠিক হয়।'' সত্যেনের মধ্যেও এক ঋষিমন ছিল, তার সন্ধান দিলীপ পেয়েছিলেন। সেজন্যই তিনি বলেছেন, ''সুভাষকে বাদ দিলে—কারণ সুভাষ আমার কাছে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরবী—সত্যেনের মতো এমন অপরূপ মানুষ সে সময়ে আমার চোখে পড়েনি।''

শিশু সুভাষচন্দ্র

ফিরে আসি দুই বন্ধুর কথায়। দুই বন্ধুর এই গল্প এরপর বাঁক নিল দুদিকে। সুভাষ যেমন তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করলেন দেশের জন্য, দিলীপ মগ্ন হলেন সংগীতসাধনায়। এক্ষেত্রেও তাঁর জীবনে সুভাষের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

লন্ডনে দিলীপ যখন পরবর্তী জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ দ্বন্দ্বে আছেন, সেই সময়কার ঘটনা। রাতে সুভাষ ও দিলীপ একই ঘরে পাশাপাশি শুয়ে আছেন। দিলীপকে বিমর্ষ দেখে সুভাষ সহজেই ব্যাপারটি আঁচ করে নিলেন। দিলীপ আর থাকতে না পেরে ব্যাকুল হয়ে সুভাষকে নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চেয়ে বললেন, ''তুমি কী বলো, বলতেই হবে।'' সুভাষ অগত্যা বললেন, ''আমি তো ভাই সঙ্গীতের কিছুই বুঝি না। তবে একথা বলতে পারি যে, গতানুগতিক পথে যারা চলে, তারা দেশকে এগিয়ে দেয় না। তাই তোমার আদর্শে যে আমার সায় আছে, তা কি আর বলতে হবে—যখন এটুকু আমি জানি ও মানি যে সঙ্গীতকে জীবনের একটি মহৎ আদর্শ বলে বরণ করা চলে।''

পরে সুভাষ আরও বলেছিলেন, ''বন্ধু, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও, আর যে-সহজ আনন্দ আমরা হারিয়ে বসেছি, তা আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো।... আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষে সহজলভ্য করতে হবে।... সঙ্গীতকে সর্বসাধারণের উপযোগী করতে হবে।''

দেশমাতৃকার ক্রন্দনের মধ্যেই সুভাষ শুনতে পেয়েছিলেন পরমাত্মার ডাক। সেজন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে, একাকী দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে আগুনে ঝাঁপ দিলেন তিনি। অন্যদিকে, যদিও ঈশ্বরসাধনাই ছিল দিলীপের জীবনের ব্রত, তবু এর পাশাপাশি চলে সংগীত এবং সাহিত্যের চর্চা। প্রায় পঁচাত্তরটি বই লিখেছেন। পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও উৎসাহ। সংগীতের জন্য 'সুরসুধাকর' উপাধিও লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক দূতরূপে বিশ্বভ্রমণে যান। ফিরে এসে পুনেতে হরিকৃষ্ণ মন্দির স্থাপন করেন। সেখানেই অধ্যাত্মসাধনায় জীবনের শেষদিনগুলি কাটান।

এদিকে ১৯২১ সালে কেমব্রিজ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে দেশের কাজে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে সুভাষ দুটি চিঠি লিখেছিলেন। দেশে

ফিরে এসে সুভাষ তাঁর মনোমতো কাজ পেলেন। বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। সেই সঙ্গে ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। তবে সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে গ্রেফতার হলেন—দুমাসের জেল। সেই সময় দিলীপ ছিলেন বিদেশে, তখন তাঁর গলা সাধা, ভায়োলিন বাজানো, ইতালীয় ঢঙে ইউরোপীয় গান শেখার পর্ব চলছে। এরই মধ্যে তিনি দুজন বিখ্যাত ব্যক্তি রোম্যাঁ রোলাঁ ও রাসেলের সান্নিধ্যে জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত।

এরপর দুই বন্ধুর পুনর্মিলন হয় কলকাতায়। বিভিন্ন আন্দোলনের সময় সুভাষের অনুরোধে গান গেয়ে টাকা তুলে দিতেন দিলীপ। ১৯২৪ সালে দ্বিতীয়বার জেলে যান সুভাষ। জেল থেকে দিলীপকে যে-চিঠিগুলি তিনি লিখতেন, তাতে ফুটে উঠত তাঁর আত্মোপলব্ধির টুকরো টুকরো ছবি।

''এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নির্জনতায় দিন কাটাতে হয়, সেই নির্জনতাই তাকে [বন্দিকে] জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে বোঝার সুযোগ দেয়। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে গেছে।... এজন্যই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অনেকখানি লাভবান হতে পারব।''

''আমার মনে হয় দুঃখ যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম ও উচ্চতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে কর, বিনা দুঃখ কষ্টে যা লাভ করা যায়, তার কোনও মূল্য আছে?''

১৯২৭ সালের মে মাসে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য সুভাষচন্দ্র মুক্তি পেলেন। তখন দিলীপ দ্বিতীয়বার বিদেশভ্রমণে ইউরোপে। ইউরোপের উচ্ছলতা অন্তঃসারশূন্য মনে হল দিলীপের। ফিরে এলেন স্বদেশে। ১৯২৮-এ শ্রীঅরবিন্দের চরণে আশ্রয় নিলেন। পরিবর্তিত হল জীবনের গতিপথ।

এরপর বেশ কয়েকবার পর্যায়ক্রমে গ্রেফতার হন সুভাষ। দিলীপেরও দিন কাটছিল পণ্ডিচেরিতে, গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দের স্নেহচ্ছায়ায়। ইতিমধ্যে জেলবন্দি অবস্থায় শরীর একেবারে ভেঙে পড়ায় ব্রিটিশ সরকার সুভাষকে ইউরোপ যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। ইউরোপ থেকেও সুভাষ দিলীপকে কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিগুলির সারমর্ম ছিল, নির্জনবাস ছেড়ে দিলীপ যেন দেশের জন্য কর্মযজ্ঞে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ঈশ্বরসন্ধানী দিলীপ সবসময়ই মনে করতেন সুভাষের বিশাল প্রেমময় হৃদয়, নির্মল চরিত্র বৈরাগ্যপথের বেশি উপযোগী।

দিলীপ আর সুভাষ ছিলেন আত্মার আত্মীয়। ১৯৩৭ সালের ছোট্ট একটি ঘটনা সেকথাই আবার প্রমাণ করল। ১৯৩৬ সালে বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসার পর আবার গ্রেফতার হন সুভাষ। ১৯৩৭-এর প্রথম দিকে একটা কথা শোনা গেল, সুভাষকে নাকি বিনা শর্তে ছেড়ে দেওয়া হবে। শোনা মাত্র দিলীপের অন্তর সুভাষকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

আট বছরের নির্জনবাস থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দিলীপ অনুমতি চাইলেন গুরুদেবের কাছে। শ্রীঅরবিন্দও অনুমতি দিলেন। কলকাতায় এসে পৌঁছনোর কয়েকদিন বাদেই দিলীপ খবর পেলেন সুভাষ ছাড়া পেয়েছে, এক্ষুনি যেতে হবে তাঁকে।

বহুদিন বাদে মিলন হল দুই বন্ধুর। দিলীপকে দেখে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন সুভাষ। দীর্ঘদিনের অশান্ত সংগ্রাম, ব্যর্থতা আর কারাবাসের ফলে তরুণ তাপসের দেহ জীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাঁর চোখে দুঃখের ছায়াপাত হয়েছে বটে, কিন্তু দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে ধ্যানের দীপ্তি। দিলীপ জানেন—সুভাষ চাপা, সেই সুভাষ কাঁদছেন? একটু

পরেই সামলে নিলেন। আর কারও কাছে সুভাষের পক্ষে এভাবে ধরা দেওয়া সম্ভব ছিল না।

কয়েক সপ্তাহ বাদে সুভাষ এক সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ জানালেন দিলীপকে। সেদিন দুই বন্ধুর মধ্যে ঘটেছিল পারস্পরিক অভিজ্ঞতা সিঞ্চিত উপলব্ধির আদান- প্রদান। দুজনেরই রয়েছে দীর্ঘ নির্জনবাসের অভিজ্ঞতা। সুভাষ বললেন, ''বাইরের জগৎটা যখন রুদ্ধ হয়ে যায়, অন্তরের জগৎ তখন উন্মুক্ত হয়ে ওঠে মানসচক্ষে। ... এর ফলে আমি একটা আলোকের সন্ধান পেয়েছি; সে-আলোক চিনিয়ে দিয়েছে আত্মার স্বরূপকে।... আমি অনুভব করেছি ঘোরতর সংঘাতের সময়ও শত্রুর প্রতি আমাদের খুব বেশি কঠোর হলে চলবে না বরং একপক্ষে তাদের ভালবাসতেই হবে।''

এবার দিলীপের পালা। এই কবছরে তাঁর জীবনের দুঃখকষ্ট পতন-উত্থানের কাহিনি উজাড় করে বললেন সুভাষকে। সব শুনে সুভাষ বললেন, ''আমার একবারও মনে হয়নি তোমার বিশ্বাসের অভাব ঘটেছে এক মুহূর্তেও। একটি বারও তুমি তোমার গুরু কী ইষ্টের সম্বন্ধে এমন কোনও কথা বলোনি, যাকে বলতে পারি disloyality।''

আরও নানা কথার পর সুভাষ দিলীপকে অনুরোধ করেন আরও কয়েকটা দিন থেকে যেতে : ''তোমার হয়ত আমাদের কাছে কোনও দরকার নেই, কিন্তু তোমাকে আমাদের দরকার আছে...।'' এই অনুরোধ মুখ ফুটে আরও দু-একবার সুভাষ করেছিলেন। দিলীপ অবাক হয়ে বললেন, ''তুমি হচ্ছ কাজের মানুষ, দেশসেবার কাজে তুমি ডুবে আছ... আর কলকাতাতে এলেও তোমাতে আমাতে দেখা হয় দৈবাৎ।'' সুভাষ এই কথার উত্তরে দিলীপের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, ''আমার জীবনের কিছুই জানো না তো। দিনরাত আমায় মেলামেশা করতে হয় যাদের সঙ্গে তারা সবাই ধূর্ত, চতুর, চক্রান্তকারী। তুমি যদি থাকতে কলকাতায় এটুকু সান্ত্বনা তো পেতাম যে, এমন একজন রয়েছে যার সঙ্গে আমার মনের কথা কইতে পারি। অন্তত ইচ্ছে করলে একজন ভাল লোকের দেখা পাব।''

দিলীপের অন্তর রাজনীতিতে সাড়া দেয় না, কিন্তু সুভাষের ডাক ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য তাঁর নেই। সেজন্য দিলীপ সুভাষকে বলেছিলেন, ''তুমি যদি রাজনীতিতে নামতে বলো আমায়—রাজি আছি। তার জন্য যদি জেলে যেতে হয় তো যাব। তোমার কথা রাখতে আমি সব সময় তৈরি। কিন্তু সত্যি বলতে কী, মনে প্রাণে আমি রাজনীতির পরিপন্থী।... এখন বলো আমায় কী করতে হবে?''

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বন্ধুর পিঠের ওপর হাত রেখে সুভাষ বললেন, ''দিলীপ তুমি কি আমায় পাগল মনে কর নাকি? আমি জানি এ-পথ তোমার নয়। শুধু শুধু আমার জন্য তোমার আদর্শ বিসর্জন দিতে বলব কেন? তুমি তোমার স্বধর্মের পথে চলো।... যদি তুমি তোমার স্বভাবের গতিকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে আপনার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারো, তাতেই তোমার সার্থকতা, সেই তো তোমার সবচেয়ে বড় দেশের কাজ করা হল। মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তোলাই মানুষের কাজ।''

এই হলেন সুভাষ। ঔদার্যের আলোয় উদ্ভাসিত মহৎ প্রাণ।

বন্ধুর শারীরিক অবস্থা দেখে দিলীপ তাঁকে পণ্ডিচেরি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সুভাষ রাজি হননি। তাঁর অন্তরের সুপ্ত বৈরাগ্য একবার জেগে গেলে ফিরে আসা মুশকিল। দেশের ডাক যিনি শুনেছেন, বৈরাগ্যকে তিনি প্রশ্রয় দেবেন কেমন করে? আর দেশের দুর্দিনে তাঁর বিশ্রামের সময়ই বা কোথায়? স্বামীজীর 'Song of Sannyasin' থেকে সুভাষ প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন : "Have thou no home/ what home can hold thee, friend?"

দিলীপ কুমার রায়

আশৈশব অভীঃ মন্ত্র জপ করে দেশের জন্য দেশান্তরী হয়েছিলেন সুভাষ। অন্তরে ছিল তাঁর সন্ন্যাসীর নিঃসঙ্গতা। দুই বন্ধুর যাত্রাপথ ভিন্ন, লক্ষ্যও আলাদা, দুজনেই স্বতন্ত্র আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ। তবু অন্তরে অন্তরে তাঁরা দৃঢ়বদ্ধ। তাঁদের জীবন, পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদান, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সর্বোপরি আন্তরিক অফুরন্ত ভালবাসা এই কথাই প্রমাণ করে। Helen Keller-এর কথায় : "True friends are never apart, may be in distance but never in heart."

দুই বন্ধুর এই সমান্তরাল পথ চলার কাহিনির ইতি টানব ১৯২৬ সালের মান্দারণ জেল থেকে দিলীপকে লেখা সুভাষের চিঠির কয়েকটি ছত্র দিয়ে : "শিল্পীর সাধনা কর্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে-সাধনা বিদ্যার্থীর সে-সাধনা নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এ সকলের আদর্শ প্রায় একই।... নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রতেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে, তাহলে অচিরেই সমগ্র জাতির নব জীবন দেখা দেয়।"

এই দুই মহান বন্ধু মানবকল্যাণে জগতে মহান দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যা আজও হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়, উদ্দীপিত করে। আর তাঁদের ওই অকৃত্রিম, নিঃস্বার্থ ভালবাসাপূর্ণ অমলিন বন্ধুত্বও জগতে বিরল। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। দিলীপ কুমার রায়, *স্মৃতিচারণ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৬

২। দিলীপ কুমার রায়, *আমার বন্ধু সুভাষ*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৭৩

গ্রাহকের প্রতি

পত্রিকার প্রতি সংখ্যা পৃথকভাবে নিতে চাইলে, চাঁদার সঙ্গে রেজিস্ট্রি চার্জ যোগ করে একবছরের জন্য (১৩০+১২০) ২৫০ টাকা এবং তিন বছরের জন্য (৩৮০+৩৬০) ৭৪০ টাকা পাঠাতে পারেন।